দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

015

মফস্বলের এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র ও আমাদের ভবিষ্যৎ

দেখলে বিশ্বাস হয় না। মনে হয় বৈশাখী মেলা বসেছে। মেলা যদিও অনেক দূরে, এখনও দু সপ্তাহ বাকি। তবুও গোটা গ্রাম জুড়ে একটি মেলার আমেজ লক্ষ্য করা যায়। বৈশাখী মেলা নয়, এসএসসি মেলা।

মফস্বলের এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে কি হচ্ছে তা নিয়ে শহরে যথেষ্ট শোরগোল। শহরের ছেলেরা শহরের কেন্দ্র এড়িয়ে যাবার জন্যে মফস্বলের স্কুলের দিকে ছোটে। কেন ছোটে এই মেলা না দেখলে তা বোঝা যেত না।

এসএসসি পরীক্ষা এখনও চলছে। শেষ হতে আর বেশি বাকি নেই। কিন্তু এই শেষ পর্বে এসে মফস্বলের একটি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র দেখার সৌভাগ্য হল। ভাগ্যই বলতে হবে। কারণ পরীক্ষা কেন্দ্রে এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে, এ রকম বিরল দৃশ্যের অবতারনা হতে পারে, সে ধারণা কখনও ছিল না। তার আগের দিন একজন অভিভাবককে বিষণ্ন মনে ঘরের বারান্দায় বসে থাকতে দেখেছি। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম তার একজন আত্মীয় পরীক্ষার্থী নকল করার দায়ে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তখন ভেবেছিলাম, বেশ। মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে যা শোনা যায়, তা হয়ত সর্বাংশে সত্য নয়।

কিন্তু পরদিন পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে হতবাক হয়ে গেলাম। বেশ বড়সড় স্কুল। তার সামনে বিশাল মাঠ। মাঠ পেরিয়ে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত। ইরির ফলন ভাল। সবুজে সবুজে ছেয়ে গেছে মাঠ। আইলের কোণায় কোণায় দু-একটা ছোটখাট গাছ। স্কুলের নিজস্ব মাঠ বরাবর বাঁশ টানিয়ে দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা আছে। সেই সীমানার ভেতরে পরীক্ষার্থী ছাড়া অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ। স্কুলের পাশে একটি পুলিশ ভ্যান দাঁড়ানো। দৃশ্যের এখানেই শেষ নয়। যত দূর চোখ গেল পুকুরঘাট, বাঁশ ঝাড়, বাড়ির দহলিজ, সবুজ মাঠ সর্বত্র গ্রুপে গ্রুপে সবেশ তরুণ তরুণীরা হামাগুড়ি দিয়ে বসে কি যেন করছে। প্রথমে মনে হতে পারে জুয়ার আসর বসেছে। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে এখনও এভাবে সাধারণত জুয়ার আসর বসে না। আসর বসেছে ঠিকই। সে আসর ভিন্ন। নকল তৈরির আসর। এই আসরে কেবল মাত্র তরুণ তরুণীরাই আসন গ্রহণ করেনি। আসন গ্রহণ করেছে বাবা মা, ভাই বোন, মামা-খালু, এমনকি দশ এগার বছরের কিশোর কিশোরীরা পর্যন্ত। স্কুলের আশপাশে নকল সরবরাহকারীদের জন্য গজিয়ে উঠেছে টেম্পোরারি পান বিড়ি, সিগারেটের দোকান, পাউরুটি কলা, দুধের দোকান কেউ কেউ তরমুজ কেটে বসে গেছে. এক ফালি দুই টাকা। হল ঘরগুলোর পেছনের জানালাগুলো খোলা সেখানে মৌমাছির মত লোকজন। সবার হাতেই নকলের পুটুলি। নানান নাম ধরে নকলদাতারা ডাকাডাকি করছে। কেউবা ছুঁড়ে দিচ্ছে নকলের বান্ডেল হলের ভেতরে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ চমৎকার। যার উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে তার হাতে তুলে দিচ্ছে অন্য কোন সহযোগী পরীক্ষার্থী। হলের ভেতরে ইনভিজিলেটর আছেন। তারা অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে সে দৃশ্য এড়িয়ে যাচ্ছেন। হয়ত কোন উপায়ও নেই। কারণ, নকল ধরে বহিষ্কার করে শেষ পর্যন্ত সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরতে পারবেন কিনা সে নিশ্চয়তা হয়ত কম। তবে পুলিশ আছে। লাঠি হাতে। পরিপাটি পোশাক। হলগুলোর পেছনে হুইসেল বাজাতে বাজাতে **কখনও কখনও ধীর** পায়ে এগিয়ে যায়। লোকজন তবু সরে না। পুলিশ আস্তে আস্তে হাত দিয়ে টেনে টেনে জানালা থেকে দু একজনকে নামায়। তার পর থথাপূর্বক তথা পরং

দেখলাম সিক বেডে একজন পরীক্ষা দিচ্ছে। তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছেন একজন মহিলা। পরীক্ষার্থীর চোখ লাল। সম্ভবত জ্বর। জন্ডিসও হতে পারে। জনা তিনেক সহকারী বই খাতা খুলে তার হয়ে লিখছে।

স্কুলের বারান্দায় অপরীক্ষার্থীদের মিছিল। কখনও কখনও শিক্ষকরা হাঁক ছাড়ছেন। এই হাঁকে কিছুটা যে কাজ হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই পুনরায় একই অবস্থা।

প্রধান শিক্ষক বললেন, আজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা। ছাত্র কম। ম্যাজিস্ট্রেটও আসেননি। ম্যাজিস্ট্রেট এলে এরকম হয় না। অন্য আর একজন তরুণ বয়সী শিক্ষক বললেন, আমাদের সময় শিক্ষকরা নকল ধরতেন। এখন তারা নকল ধরেন না। হয়ত নকল ধরতে সাহসও পান না।

তবে একথা সত্য, ম্যাজিস্ট্রেট ভীতিই সম্ভবত মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর একমাত্র ভীতি। অনেক পরীক্ষার্থীকে বলতে শুনলাম, গতকালের পরীক্ষা ভাল হয়নি, ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিল। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর নকল নিয়ন্ত্রণ কিভাবে সম্ভব, বোঝা দায়। এখানে চেনা জানা কোন শিক্ষকের পক্ষে নকল ধরা বলতে গেলে অসম্ভব। ভয় এই যে, চেনা জানা কেউ নকল ধরে বহিষ্কার করলে অভিভাবকরাই লাঠিসোঠা নিয়ে ছুটে আসবে।

গ্রাম-গ্রামান্তরের পরীক্ষা কেন্দ্রের ওই সম্ভবত সাধারণ চিত্র। কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্র গ্রাম-গ্রামান্তরে না নিয়েই বা উপায় কি? পরীক্ষার্থী বেড়েছে। এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর শুধুমাত্র শহরাঞ্চলের কেন্দ্রগুলোতেই সংকুলান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং পরীক্ষাকেন্দ্র সরাতেই হবে।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, পরীক্ষাকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে থাকলে সেখানে পরিস্থিতির এর চেয়ে উন্নতি ঘটানোর সম্ভাবনা কম। সেখানে নকল নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সংখ্যায় পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন করা দরকার তা হয়ত কখনও সম্ভব হবে না। তাহলে?

কিন্তু এ অবস্থাতো মেনে নেয়া যায় না। একই সঙ্গে আরও একটি প্রশ্নও এখানে উত্থাপন করতে চাই, তাহল বালক বয়সী নকল সরবরাহকারীদের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। ফোর-ফাইভে পড়া যে বালক জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নকলের পুটলি ছুঁড়ে দিচ্ছে হলের ভেতরে, তার জন্যে কি ভবিষ্যত নির্মাণ করতে যাচ্ছি আমরা? তার কাছে কি লেখাপড়া সামান্য মূল্যও বয়ে আনতে পারবে? তাকে কি আমরা লেখা পড়ায় কোনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারব? পরীক্ষায় যারা নকল করছে তারা যদি পাসও করে, তবু এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যত সামনে নিয়েই এসএসসির বৈতরণী পার হচ্ছে। যারা এখনও এসএসসি থেকে অনেক দূরে তাদের জন্য এই সমাজের প্রতিশ্রুতি কি? এ রকম একটি বালককে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম—কে পরীক্ষা দিচ্ছে তার? বলল, চাচা। আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করিনি।

এই অবস্থার অবসান দরকার। শিক্ষার ন্যূনতম মান যদি ধরে রাখতে হয়, যদি শিক্ষাকে সত্যি সত্যি অর্থবহ করে তুলতে হয়, তাহলে নকলের এই কলংক আমাদের অবশ্যই মোচন করতে হবে। আমাদের প্রয়াশ বলি, শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে। পড়ে যে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক সময় বলা হত চল্লিশ সালের ম্যাট্রিক। অর্থাৎ তার পড়াশোনায় খাদ নেই। এখন বলা হয় সত্তরের আগে পাস করেছি। তার অর্থ সত্তর পর্যন্ত পাসে নকলের এই কারবার ছিল না। এখন আর এ ধরনের কোন মিথ নেই। কে কিভাবে পাস করেছে সেটা বড় কথা নয়। পাস করেছে কিনা সেটাই মুখ্য। আবার এও আছে যে, উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতার বাজারে নকল করেই করুক, আর নকল না করেই করুক, প্রথম বিভাগে পাস না করতে পারলে ভর্তির দরখাস্তই করা যায় না। পড়তে যে শুরু করেছে পড়াবার সংগতি যার আছে, তারা কেন দেখবে না উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন। নকল করে যদি সেই স্বপ্ন সফল হয়, নকল না করলে যদি সেই স্বপ্ন ভন্ডুল হয়ে যায়, তাহলে নকল করায় দোষ কমই। ফলে আজকাল অভিভাবকরাও হাজারে বিজারে নকলের সমর্থনেই এগিয়ে আসে।

সুতরাং নকলের সমস্যাকে সামগ্রিক নিরিখে বিবেচনা করা দরকার। আমরা মনে করি পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমেই এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান অর্জন করা সম্ভব। ট্রাডিশনাল পরীক্ষা পদ্ধতি যে তার কার্যকারিতা হারিয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবেন না। সুতরাং সেখানে আটকে না থেকে নতুন পথের উদ্ভাবন একান্ত জরুরী। তা নাহলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও যোগ্য ছাত্রের ভর্তি কোনদিনই সম্ভব হবে না। নকলের জোরে যে প্রথম বিভাগ পেল, উচ্চ নম্বর পেল সে-ই যাবে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। সেসব সিঁড়ি ডিঙ্গাতেও তাকে পুনর্বার নকলেরই আশ্রয় নিতে হবে। হয়ত এভাবে সে একদিন ক্ষতিকর অশিক্ষা নিয়ে ডিগ্রিও যাবে উচ্চশিক্ষার দাফ। আসন করে নেবে প্রশাসনে কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। অথচ নকল না করে যে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছিল হয়ত সে নিষ্ঠায় ও মেধায় ছিল নকলকারীর অনেক ওপরে। কিন্তু পরাভব তার নিয়তি হয়ে দাঁড়াল।

তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে, দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সাথে পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য আশু ব্যবস্থা নেয়া হবে সেটাই কাম্য।

—রেজোয়ান সিদ্দকী